মূলপাতা

সম্পর্কের টানাপোড়েন

Nusrat Rahman

June 14, 2020
18 MIN READ

[১]

ক্যারিয়ার ও প্রযুক্তি নির্ভর জীবনে খুব দ্রুত যে জিনিসটা বদলে যাচ্ছে তা হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। মানুষ এখন তার গন্ডি থেকে বের হয়ে সহজেই নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে আসন গাড়ছে। এই বদলে যাওয়া ফ্রেমে যখন সে সম্পর্কের পুরনো ছবিটা বসাতে যায় তখন মেলাতে পারেনা। পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে বদল হয় একজনের প্রতি আরেকজনের চাহিদা, আশা আকাঙ্ক্ষা – অনেক সময়ই দেখা যায় এই পরিবর্তনটা একজন অনুভব করতে পারলেও অপরজনের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেনা। ফলে একজন হয়ত পুরনো দিন, পুরনো চাওয়া আঁকড়ে ধরে হা হুতাশে ব্যস্ত, অপরজন হয়ত নতুন জীবনের নতুন চ্যালেঞ্জ একা একা মোকাবেলা করতে করতে ত্যক্ত।

আমরা অনেক সময়ই সম্পর্কজিনিসটাকে খুব গ্র্যান্টেড ধরে নেই। মা আছে – আমি মায়ের সাথে যাই করি না কেন, মাকে গালিগালাজ, অবহেলা, অসম্মান, যা খুশি – তবু মায়ের যা যা করণীয় তার থেকে এক কণা কম দেখলে মায়ের উপর রাগ। মা এক সন্তানকে বেশি ভালবাসবে এ ব্যাপারটা আমরা অনেকেই মানতে পারিনা। অথচ যে সন্তান সবসময় মায়ের সেবা করে আসছে, ছোট্ট ছোট্ট খুশিগুলোকেও যত্নের সাথে পূরণ করে আসছে – তার প্রতি মায়ের সন্তুষ্টি বেশি থাকবে – এটাই ত স্বাভাবিক, তাই না? যে উদ্দেশ্যে এই কথাটা বলা – আমরা 'মা ত মাই, বন্ধুত চিরকালই বন্ধু, স্বামী ত দলিল করা অধিকার' – এই মানসিকতা থেকে নিজেকে সরিয়ে যদি মনে করতে পারি, এটা একটা সম্পদ, এটাকে রক্ষা করার জন্য আমার শ্রম দিতে হবে – তাহলেই কেবল মাত্র আমার নোটটা পড়ে আপনারা উপকৃত হতে পারেন।

এখন নেটওয়ার্কিং খুব সহজ হয়ে যাওয়ায় আমরা একটা সম্পর্কই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাকাপোক্ত করার থেকে নতুন নতুন সম্পর্কট্রাই করার প্রতি মনোযোগী হয়েছি। একই সাথে আমাদের বিনোদনগুলি এখন এমন যে তা উপভোগ করার জন্য অন্য কেউ পাশে থাকার প্রয়োজন নেই। এতে করে যেটা হয়েছে, আমরা প্রথম থেকেই কম ইন্টারএকশন করে বড় হচ্ছি। সুতরাং আমরা একটু অন্যরকম ব্যবহার দেখলেই ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছি।

দ্বিতীয়ত, মানুষের থেকে মুখ ঘুরিয়ে শান্তি পাওয়ার জন্য অফুরন্ত বিনোদনের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং প্রবলেম আসলেই আমরা মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে নিজেকে আপন জগতে গুটিয়ে নিচ্ছি।

তৃতীয়, সম্পর্কের প্রতি দায়িত্ববোধের ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্পষ্ট না। একটা সম্পর্কগড়লে (সেটা কলিগই হোক, প্রতিবেশীই হোক, শাশুড়ি বউই হোক, আর বাবা ছেলেই হোক) সেটার সাথে যেসব এক্সপেক্টেশন জড়িত থাকে সেসবের ব্যাপারে উদাসীন হয়েও আমরা দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারছি। খুব কাছের মানুষও এসব ব্যাপারে আঙুল তুলে চোখে দেখিয়ে দেয়ার অধিকার রাখেনা, যেহেতু আমরা পার্সোনাল ব্যাপারের সীমাটা বাড়াতে বাড়াতে সব কিছুই তার মধ্যে এনে ফেলেছি।

চতুর্থ, সাফল্যের মাপকাঠিটা এখন পুরোপুরিই ক্যারিয়ারভিত্তিক হওয়াতে এ বিষয়গুলো এখন অনেকটাই গৌণ। মানুষ ব্যালেন্সড লাইফ অর্জন করার বদলে জিনিয়াস হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাই ফ্যামিলি লাইফে বা সোস্যাল লাইফে কে কতটুকুইনভলভড, এ ব্যাপারটা যেন আজকাল পাত্তাই পেতে চায়না। ক'টা বাবা মা এখন সন্তানকে পড়াশুনার বাইরে অন্য কিছু করতে উৎসাহ দেন? এতে করে সন্তানেরা ছোটবেলা থেকেই একটা মেসেজ পেয়ে যায় যে পড়াশুনা (নামান্তরে ক্যারিয়ার) এর সাথে কোন আপোষ চলবেনা। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীতে একটা মানুষকে খুব আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর করে তোলে।

[২]

একটা সম্পর্কের মধ্যে সমস্যা আসলে আমরা বিভিন্নভাবে রিঅ্যাক্ট করি।

১. অপরপক্ষ যখন একটা অন্যায় করে তখন বেশিরভাগ মানুষই আত্মসম্মান ঠিক রাখার জন্য ডিফেন্সিভ মোডে চলে যায়। ব্যাপারটা খুব সহজ, "তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ, আমি এটা ডিজার্ভ করিনা। আর তুমিও আমার ভালবাসা, আমার কেয়ার পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছ। অতএব এখন থেকে তুমি আমার সাথে যেমন, আমিও তেমন হব। কারণ তুমি নিজেই আমার এই অসন্তুষ্টি অর্জন করেছ।"

এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন দোষ নাই। যে কোন প্র্যাকটিক্যাল মানুষই এই অ্যাপ্রোচ নেবে। এতে সুবিধাও আছে। এখন থেকে তার প্রতি আগের চেয়ে কম যত্ন নিলেও হবে। ইগো হার্ট হওয়ার রিস্কটাও নিতে হবে কম। আবার তার প্রতি কর্তব্যে ঢিল দেয়ার দায়টাও আমার ঘাড়ে না, আগেই যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি যে আমার এই উদাসীনতা তোমারই কারণে, দোষ আমার, কিন্তু দোষী তুমি।

এই ব্যাপারে আমার বলার কিছু নাই। এটা এখনকার পপুলার অ্যাপ্রোচ। এর ভাল দিক সবাই দেখতে পায় যখন সে নিজে এটা ব্যবহার করে, আর তার উপরে দেখানো হলে আর মানতে পারেনা। আর এভাবে আসলে প্রতিটা মানুষ নিজের চারপাশে একটা ডিফেন্সিভ শিল্ড নিয়ে রাখলে সেখানে সত্যিকারের কোন সম্পর্ক থাকেনা।

ব্যাপারটা একটা যুদ্ধ, একটা কূটনৈতিক সম্পর্ক হয়ে যায়। (বিশ্বাস করুন, আমাকে অনেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, বিয়ে নাকি পুরোপুরিই কূটনীতি, এই সম্পর্ক ভালবাসা না, দেনাপাওনার কড়া হিসাবের উপরে টিকে থাকে!)

২. দ্বিতীয় অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কচ্ছপ অ্যাপ্রোচ। তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ, আমি কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু আমি তোমাকে এতই ভালবাসি যে আমি তোমাকে উল্টো আঘাত করবনা। চুপ করে সহ্য করব, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকব, তারপর একটা সময় ভুলে আবার আগের মতই ভালবাসব।

এটাও খুব ভাল। খুব কম মানুষই ভালবাসার জোরে অন্যায় কে উপেক্ষা করে ক্ষমা করে দিতে পারে। কিন্তু এটা ভাল তখনই, যখন অপরপক্ষ জানে যে সে যা করছে সেটা অন্যায় করেছে। তখন এই ওভারলুক করা ওকে নিজের মত অনুতপ্ত হওয়ার স্পেস দিবে। ঐ মানুষটার মহানুভবতা দেখে আরো ভালভাবে তার কাছে ফিরে আসবে।

কিন্তু যে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই মনে করছে যে সে ঠিক, সেখানে এই অ্যাপ্রোচ কিন্তু কাজে আসেনা। সম্পর্ক একটা সিঁড়ির মত। এটাকে প্রতি ধাপে ধাপে তৈরি করতে হয়, মজবুত করতে হয়। কচ্ছপ হয়ে গেলে কিছুদিনের জন্য এই কাজটা বন্ধ থাকে। কিন্তু এই ক্ষমা, নীরবতা যদি অপরপক্ষকে কোন পজিটিভ মেসেজ না দেয়, তাহলে কিন্তু একই ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি গড়ার কাজটা এতটাই ঢিলে হয়ে যাবে যে তার অস্তিত্ব নিয়েও সন্দেহ তৈরি হবে। তাছাড়া একপক্ষ বার বার এভাবে ছাড় দিতে দিতে ভাববে, "সবসময় কেন আমিই স্যাক্রিফাই করব?" যেখানে সে মনে করছে সম্পর্করক্ষার কাজে সবটুকু স্যাক্রিফাইস সে করছে, অন্যজন হয়ত একই সময় তার কচ্ছপ মনোভাব দেখতে দেখতে ক্ষুব্ধ।

[৩]

ডিফেন্স, কচ্ছপ – সবই ভাল, কিন্তু এগুলো সবই সাময়িক স্বস্তি আনে। ডিফেন্ড করলে নিজের ইগোকে ঠিকঠাক রাখা যায়, আর গুটিয়ে থাকলে অপরপক্ষকে জয়ী করে নির্বিবাদে থাকা যায়। সত্যিকার অর্থে সম্পর্ক দৃঢ় করতে এ ধরণের অ্যাপ্রোচ কতটুকু কাজে আসে? উত্তরটা পাঠকের কাছ থেকেই জানার অপেক্ষায় থাকলাম।

৩. তৃতীয় অ্যাপ্রোচের কোন যুতসই নাম আমি খুঁজে বের করতে পারিনি। এটা অনেকটা, “আমি তোমার কাজে কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলে কিছু বললাম না। কিন্তু আমি জানি কখনোই না বললে তুমি বুঝবেনা যে আমি কষ্ট পেয়েছি।” সোজা ভাষায়, প্রবলেম আসলে তাকে ঠান্ডা মাথায় ডিল করতে হবে। তাকে জানিয়ে দিতে হবে যে এ ব্যাপারটা আমার কাছে ন্যায়সঙ্গত লাগেনি।

মজা হচ্ছে, এই যে আপনি ধৈর্য ধরলেন, পাল্টা শোধ নিলেন না, ক্ষমা করলেন, তারপরে আবার সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পর ঠান্ডা মেজাজে ঘটনাটা তুলে বললেন যে এই ব্যাপারটা আপনি পছন্দ করেননি – অপর পক্ষ কিন্তু আপনার এতগুলি ভাল দিক দেখতে পাবেনা। ঐ ঘটনা উঠে আসার সাথে সাথে সেও নিজেকে ডিফেন্ড করতে শুরু করবে। সত্যি বলতে কি, সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে পুনরায় ঐ প্রসঙ্গ তোলাটাকেই সে অপমান হিসেবে নিয়ে ফেলতে পারে। কারণ রাগত: অবস্থায় নিজের অন্যায়কে ডিফেন্ড করা যত সহজ, ঠান্ডা মেজাজে, সুন্দর সময়ে সেটার উল্লেখ ততটাই বিব্রতকর। এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচাতে মানুষ সবচেয়ে সহজ উপায়টা বেছে নেয় – হয় রাগ করে, নাহয় কান্নাকাটি করে, তার সাথে পুরনো যত অন্যায় তার উপর করা হয়েছে সেসব বলা শুরু করে। অথবা এমন কোন মন্তব্য করে যাতে করে পুরনো লজ্জা ঢাকা পড়ে যায়।

এই পর্যন্ত এসে মানুষ সবচেয়ে বেশি হাল ছেড়ে দেয়। মনে মনে বলে, “আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, তার সাথে খারাপ ব্যবহার করি নাই, রাগ করি নাই, তাকে অবসর সময়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি – কিন্তু সে কিছুতেই কিছু শোনে না। আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে কী করত?” সে দেখতে পায়না যে এই বোঝানোর মধ্যে তার ইফোর্টের কমতি ছিল। কীভাবে বললে সে অফেন্ডেড না হয়ে কথাগুলো শুনবে এবং মেনে নিবে সেটার উপর সে আরো অনেক মনোযোগ দিতে পারত।

প্রত্যেকটা সম্পর্কএকেকটা খুউব দামী রত্নের মত – এটা রক্ষা করতেই হবে কারণ এটা মূল্যবান! এইখানে মানুষটার চেয়েও বেশি গুরূত্বপূর্ণ এই বন্ধনটা। মানুষটা খারাপ হলে তার মানে এইটার উপর বেশি কাজ করতে হবে, এমন না যে মানুষটা খারাপ তাই ঐ সম্পর্ককে আমি আর শ্রদ্ধাই করব না। বা ঐ সম্পর্কটা থেকে আমি কিছু পাওয়ার আশা চিরতরে বন্ধ করে দিব।

বুঝলাম, একবারে না হলে বারবার কমিউনিকেট করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? একই ভাবে? এইখানেই দ্বিতীয় ভুলটা আমরা করি, আমরা একই মেসেজ বার বার একই ভাবে দিতে চাই। ধৈর্য ধরলাম, কথা বললাম, শুনলো না, আবারো ধৈর্য ধরলাম, আবারো কথা বললাম, আবারো, আবারো। ফলাফল হিসেবে আপনি কি অন্য কিছু দেখার আশা করছেন?

সম্পর্কটিকিয়ে রাখার জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য দিয়েই কাজ চলে যাচ্ছিল। এই স্টেজে এসে দরকার পড়বে আপনার ইন্টেলেক্ট এর। যেহেতু স্ট্রেইট ফরোয়ার্ডডিসকাশন দুইজনের জন্য একইভাবে কাজ করেনা – আপনার এখন ঐ মানুষটিকে স্টাডি করা শুরু করতে হবে। সে কী ধরণের কথায় ইন্সপায়ার্ডহয়, কোন ধরণের অভিযোগ শোনার সাথে সাথে তার মনের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়, কী ধরণের চিন্তা তার মধ্যে ভাল কাজ করার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, লজিক গ্রহণ করার ক্ষমতা তার মধ্যে কতটুকু(সবাই কিন্তু একভাবে হক্কথা নিতে পারেনা) – এই সব ধরণের তথ্য আপনার ভেতর জমা করতে হবে। তারপর তার পছন্দসই উপায়ে কথাগুলো তাকে বোঝাতে হবে।

অনেক সময় এমন হয়, কথা যত সুন্দর করেই অ্যাক্সেপ্ট করুক, কাজে তার প্রতিফলন হয়না। সাতকাহন গল্পে নায়িকাটার যার সাথে বিয়ে হয়েছিল সে ছেলেটা খাবারের টেস্ট ভাল না হলে ব্যঙ্গ করত, রেগে যেত। পরে হাজারবার সরি টরি বলে প্রমিজ করত যে আর করবেনা, কিন্তু কীভাবে কীভাবে যেন আবারো একই কাজ করত। এ রকম অবস্থায় মানুষ প্রায়ই পড়ে, আর তখন ক্ষমা করাটা সত্যি, সত্যিই অসম্ভব হয়ে যায়।

[৪]

আগের লেখাগুলি পড়লে দেখবেন আমরা টানাপোড়েনের এমন এক তিতিত্যাক্তকর অবস্থায় পৌঁছে গেছি যেখানে অনেক ধৈর্য ধরে নানাভাবে কমিউনিকেট করে মানুষটাকে কনভিন্স করার পরেও তার কাজে যথেষ্ট পরিবর্তন আসছেনা। নিজেকে ঐ

অবস্থায় একটু চিন্তা করে দেখুন, রাগে গা চিড়বিড় করতে থাকবে। মনে হবে, কীসের জন্য এত কিছু করব? আমি কি এতই ফেলনা? আমার চাওয়াপাওয়ার কোন দাম নেই? আজকে আমি ওকে ফেলে গেলে সে কোথায় থাকবে?

এই যে এই ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত বিচার বিশ্লেষণ – এই কাজটা শিকেয় তুলে রাখতে হবে যখন আপনি সত্যি সত্যিই সম্পর্কের উপর কাজ করছেন। প্রথমত: আপনি কাজ শুরুই করেছেন এটা নিশ্চিত হয়ে যে সমস্যাটা আপনার মধ্যে না। সে বোকা, সে ইমম্যাচিউর, সে গাধা, সে অহঙ্কারী, সে স্বার্থপর – কিন্তু এই মানুষটাই একটা সময় অন্যরকম ছিল যা দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন। কোন না কোনভাবে আপনার মন ছুঁয়ে যাওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল। এখন পারিপার্শ্বিকতার চাপে সে নিজেকে ভুলে গেছে, অথবা সে বেচারার বেড়ে ওঠাই এমন এক পরিবেশে যে এই অন্যায়টা তার কাছে লজিক্যাল। এই চিন্তা ধরে কাজ শুরু করলে আপনি বাই ডিফল্ট একটা উঁচু স্তর থেকে ঐ হতভাগা মানুষটাকে দেখছেন। তার কাজ আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে কারণ সে মূর্খমানবের আপনার লেভেলে ওঠার যোগ্যতা নেই। আপনি মনুষ্যত্বের দিক থেকে নিচে পড়ে থাকা একটা প্রাণীকে হাত ধরে উপরে তোলার চেষ্টা করছেন, সে এতটাই উদ্ভট যে হাতটা ধরতে গেলে পর্যন্ত কামড়ে দিচ্ছে। এবার বিচারের ভার আপনার উপর। তাকে ওখানেই ছেড়ে আসবেন চিরকালের মত? আপনি হাতটা শক্ত করে না ধরলে কিন্তু কোনদিন সে আলোর মুখ দেখবে না!

যাই হোক। মনটাকে স্থির করে নিয়েছেন ত? এবার ইন্টেলেক্টের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। আপনি নিজেকে তার জায়গায় বসান। তার মত করে চিন্তা করুন। তার পরিবেশ, বেড়ে ওঠা, স্ট্রেস ডিল করা, চিন্তা করা, ইন্সটিংক্ট এর দাসত্ব করা, ইগো নিয়ে চলা – সব অবজার্ভ করুন। এতটাই তাকে স্টাডি করুন যে একটা কিছু হলে আপনি সাথে সাথে বুঝে ফেলতে পারেন যে সে কী বলবে বা কী চিন্তা করবে। এর মধ্যে দেখবেন ওর আরো অনেক নেগেটিভ দিক আপনার সামনে চলে আসছে, ওভারলুক করুন, আপনি ড্যাটা কালেক্ট করছেন, সে ভাল না মন্দ সে বিচারে যাবেন না।

এতখানি রিফ্লেক্ট করার পর আপনি এমনিতেই বুঝতে পারবেন, একটা দুটো বিশ্বাস, বা কোন একটা পুরনো ঘটনা তার মনে ঐ ব্যাপারটা শক্ত করে গেড়ে দিয়েছে, যার কারণে সে নিজের অজান্তেই ওটাকে ঘাঁটি করে সবসময় অন্যায় কাজটা করে যাচ্ছে। আমার এখানে এক পরিচিত ভদ্রলোক সবসময় সব পাকিস্তানিকে গালি দিয়ে কথা বলেন। উনার মনে মুক্তিযুদ্ধজনিত পাক-বিদ্বেষ এমনভাবে ঢুকেছে যে আস্ত জাত তুলে গালি দেয়া উনার কাছে খুবই লজিক্যাল মনে হয়। উনি এর মধ্যে দোষ দেখতে পাননা। আমরা যারা সাব-কন্টিনেন্ট থেকে এসেছি তারা সময়ের ব্যাপারে খুবই দায়সারা (সবাই না), এর কারণ আমরা যে সেটআপে বড় হয়েছি সেখানে এটা তেমন দোষের কিছু না। এখন আমার আমেরিকান সুপারভাইজর যদি এ ব্যাপারে খুবই অনমনীয় হয় তখন আমাদের সম্পর্কের অবনতি হবে। এরকম প্রত্যেকটা কাজের পিছনেই মানুষের নিজস্ব ফিলসফি বা মাইন্ড সেটআপ থাকে। সেটা বুঝে ধৈর্য ধরে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর কাজ করলে হয়ত সমস্যার মূল ধরে তুলে আনা যাবে।

কী? খুব বেশি পরিশ্রম মনে হচ্ছে? আপনার কী ধারণা? সম্পর্কএতই সস্তা? একটা সত্যিকার সুন্দর সম্পর্কের কথা চিন্তা করুন ত চোখ বুজে? যে সম্পর্কেশ্রদ্ধা আছে, বিশ্বাস আছে, ঠাট্টা করার মত ইলাস্টিসিটি আছে, আশ্রয় আছে, শান্তি আছে – এমন মধুর সম্পর্ককি আমাদের এই পঙ্কিল পৃথিবীতেই স্বর্গের সান্নিধ্য দেবেনা?

[৫]

এতদিন আমি আলোচনা করছিলাম সম্পর্কেতিক্ততা তৈরি হলে মানুষ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। আজকে চেষ্টা করব আমাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলতে – যা আমাদের ধৈর্য বা সহিষ্ণুতাকে কমিয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছে। সোজা ভাষায়, তিক্ততা কেন তৈরি হয়? মানুষ তার প্রিয় মানুষটার উপর কেন বিরক্ত হয়? কেনই বা তা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জিইয়ে রাখে?

সম্পর্কেআমরা কিছু অগ্রিম ধারণা করে বসে থাকি। যেমন – আমি তাকে যেভাবে ট্রিট করি, সেও ঠিক একইভাবে আমাকে

দেখবে। এই যেমন, সে একটা কিছু অপছন্দ করলে আমি সাথে সাথে সেটা ত্যাগ করি, উল্টোভাবে সে কেন করেনা? অথবা, আমি তাকে আমার সব গোপন কথা বলি, সে কেন বলেনা?

এইভাবে মানুষ চিন্তা করতেই পারে। কিন্তু তখন সে এটা ভুলে যায় যে সে তখন নিজের সেট করা মাপকাঠিতে অন্য মানুষটাকে মাপছে। অন্য মানুষটা যে অন্য রকম হতে পারে, তার ছাড় দেয়ার মাত্রা বা আবেগ অনুভূতি প্রকাশের ধরণ যে পুরোপুরি তার থেকে আলাদা হতে পারে – এ ব্যাপারটা সে উপেক্ষাই করে যাচ্ছে। এমন একটা ঝগড়ার কথা ভাবুন, যেখানে আপনি বলছেন, 'আমি এই এই করি, তুমি কী কর?' উত্তরে কেবল হয়ত সে একটা কথাই বলবে, 'আমি তোমার মত না। তুমি সবকিছু নিজের দিক থেকে চিন্তা কর। তুমি আমার দিকটা বোঝনা...।' আপনার কি তখন তাকে খুব জেদী মনে হবে? খুব অযৌক্তিক মনে হবে? সে কিন্তু একদম সত্যিকার সমস্যাটাই বলছে, যে তুমি আমার মত করে আমার কাছে কোনটা ভাল মনে হয় সেটা বোঝনা। বরং তোমার যা ভাল লাগে সেটাই চাপিয়ে দিতে চাও। এই ধরণের ক্ল্যাশ বাবা মায়ের সাথে ছেলেমেয়েদের খুব হয়! কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাবা মা বোঝা ত দূরের কথা, ছেলেমেয়েদের চিন্তার পিছনে যে কোন লজিক থাকতে পারে, এটাও বুঝতে চান না। উল্টোটাও ঠিক। ছেলেমেয়েরা মনে করে বাবা মা আদিযুগের। তারা আমাদের সমস্যা বুঝবে না।

যে মানুষগুলি নিজের গড়া স্ট্যান্ডার্ডে অন্যদের বিচার করে তারা কিন্তু নিজেরাও প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে 'টিল ভার্সাস পাটকেল' এর আশ্রয় নেয়। তারা করে কি, খারাপ ব্যবহার পেলে হুবহু একই রকম করে তাকে নকল করে। বোঝানোর জন্য না শাস্তি দেয়ার জন্য না নিজের ইগোকে ঠিকঠাক রাখার জন্য কে জানে! তবে এটা করলে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভালবাসার সম্পর্কটা কমে আসে। যদি আমার একটা দুর্বলতার জন্য অপর পক্ষ ঠিক একই ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, তখন হতাশা আসে।

আর মনে হয়, 'আমার এতদিনের আদর, ভালবাসা, কেয়ার এর কি তাহলে কোনই মূল্য নেই?' কোন মানুষই খারাপ ব্যবহারের প্রতিদানে পাল্টা সমপরিমাণ খারাপ ব্যবহার পেলে 'সমানে সমান' মনে করে ভুলে যেতে পারেনা। অর্থাৎ, লজিক এর দিক থেকে জিনিসটা যতই ঠিক থাকুক, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ভাল ফল এনে দিতে পারেনা।

[৬]

আমি বলছিলাম আমরা প্রতিটা সম্পর্কের মধ্যে কিছু অগ্রিম ধারণা করে রাখি। যেমন রেসপন্সিবিলিটি। এরকম ত অনেক শুনতে পাই, সে স্বামীর দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করছে না, উনি বাবা হিসেবে ভাল না, আজকাল কোন মেয়েই নাকি ভাল স্ত্রী না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মানে মানুষটা নিজে যেমনই হোক, ঐ রোলটাতে সে ঠিকমত পারফর্ম করতে পারছেনা। এই ক্ষেত্রে দুইটা কারণে মেজাজ খারাপ হয়।

এক, আমি ধরেই নিচ্ছি যে সে ঐ পজিশনটায় তার দায়িত্ব কর্তব্য খুব স্পষ্টভাবে জানে। আর যদি নাও জানে, তাহলে একবার আলোকিত করার সাথে সাথে হার্ডডিস্ক ফরম্যাট হয়ে নতুন জিনিস ঢুকে গেল, বাকি জীবন আর এর নড়চড় হবে না।

একেকটা সম্পর্কের রেসপন্সিবিলিটি গুলো সবসময়েই জলবৎ তরলং না। সুতরাং সাধারণভাবে এরকম 'সেট অব রুল' কোথাও পাওয়া যাবে, আর ভুল হলেই তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে – মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এত সোজা সাপ্টা না। অবশ্য চাকরি বা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্কের মধ্যে যেহেতু দায়িত্বগুলি পরিষ্কার লেখা থাকে, এতে অসুবিধা কম হয়।

নতুন সম্পর্ক গড়তে গিয়ে মানুষ যে ভুলটা সবসময় করে, তা হচ্ছে, সে স্পষ্ট করে বলে নেয়না, তার থেকে সে কী কী আশা করে। পরবর্তীতে পথ চলতে চলতে পছন্দসই না হলে তর্ক জুড়ে দেয়, এটা ত খুবই অবভিয়াস, সব তোমাকে বলে দিতে হবে কেন? বোঝেনা, তার কাছে যা খুবই স্বাভাবিক, অন্যজনের জন্য হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পারিবারিক কাঠামোতে বেড়ে ওঠায় খুবই আনকোরা, অদ্ভুত। আবারো একই কথা চলে আসছে, মানুষ যদি নিজের ধ্যানধারণার গন্ডি থেকে বের হয়ে এসে অন্যজন কে দেখতে না পারে তাহলে কখনোই তার সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হতে পারবেনা। কিন্তু আন্তরিক ত হতেই হবে! আর কতদিন মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মম্ভরিতার মধ্যে ডুবে থেকে তার এত এত সম্ভাবনা কে নষ্ট করবে?

কারো কারো খুব অদ্ভুত ধারণা যে সম্পর্করক্ষা করার জন্য ভালবাসাই যথেষ্ট। ব্যস্ত বাবা মা যেমন কোয়ালিটি টাইম কাটাতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছে, অনেক বিবাহিত দম্পতিও দাম্পত্য জীবনকে ডেটিংএর পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছেন। কারো বিপদে কেউ নাই, যার যার আনন্দ তার তার, হয়ত যখন দু'জনেরই মনে চাবে তখন হয়ত কিছুটা সময় ভাব ভালবাসা হবে। বাকি পুরোটা সময় যে যার আপন জগতে মগ্ন।

দায়িত্বজ্ঞানের অভাবজনিত তিক্ততা আরেকটা কারণেও হতে পারে। যে মানুষটা সম্পর্কের খুব মোটা চোখে দেখতে পাওয়া দায়িত্বগুলি সম্পর্কেউদাসীন, সে হয়ত বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর পরেও পুরোপুরি জায়গামত আসবেনা। এখন অপরপক্ষ যদি এই গোয়ার্তুমি জিইয়ে রাখে যে তাকে ১০০% হতেই হবে এবং সেটা খুব শিগগিরই.. তাহলে সমস্যা হতে বাধ্য। এই সমস্যা পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক – দু'রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রেই সত্যি। ভুল উপেক্ষা করা ও অপরপক্ষের ভুলের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মত সহিষ্ণুতা না থাকলে সম্পর্কের ব্যালেন্স নষ্ট হতে বাধ্য।

তবে একই সাথে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, ভুল দু'টো কারণে হতে পারে। সাময়িক বিচ্যুতি অথবা সেই এক্সপেক্টেশনের প্রতি অশ্রদ্ধা। অনেক সময় সাময়িক বিচ্যুতি করে ফেললে অপর পক্ষ এটাকে দেখে তার চাওয়া পাওয়ার প্রতি উদাসীনতা হিসেবে। এতে করে যাকে দোষী করা হল তার মধ্যে মান অভিমান, পরবর্তীতে নিজেকে শোধরানোর ইচ্ছা কমে আসা – এসব তৈরি হয়। অনেক সময় এটাও হয় যে দোষগুলো মূলত হচ্ছে যথেষ্ট আগ্রহ নেই বলে, কিন্তু ভুলকারী বারবার সেটাকে চালিয়ে দিচ্ছে সাময়িক স্খলন বলে। এক্ষেত্রে অপরপক্ষের উচিৎ তার প্রতিটা কাজকেই ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝে শুনে তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া। কারণ ভুল হয়ে গেলে আরেকবার সুযোগ দেয়া সহজ। কিন্তু উদাসীনতা দূর করতে আরো অনেক বেশি কাঠখড় পুড়াতে হয়।

[৭]

কী ভেবেছিলাম আর কী হল!

হ্যাঁ। সম্পর্কের মধ্যকার হিডেন এক্সপেক্টেশন বা অগ্রিম ধারণার মধ্যে সবচেয়ে প্যাঁচালো অবস্থা এটি। মানুষ নাটক নভেল পড়ে বা অন্যদের সাথে তুলনা করে মনে মনে নিজে সুখী হওয়ার কিছু ক্রাইটেরিয়া দাঁড় করিয়ে ফেলে। ঐ বান্ধবীর স্বামী তার জন্য প্রতিদিন ফুল নিয়ে আসে, আমার স্বামী আনেনা – আমি কত দুঃখী! সবার ফ্ল্যাটবাড়ি হয়ে গেল, আমার কুলাঙ্গার সন্তান এখনও মাথাগোঁজার একটা ঠাঁই করে দিল না – আমার মত অভাগা কয়টা আছে? মজাটা হচ্ছে, এ ধরণের দুঃখবোধে যারা জর্জরিত হয়, তারা সবসময় নিজেরাও ঠিক নিশ্চিত হতে পারে না, ঠিক কোন কাজগুলি আসলেই তাকে সুখী করে, আর কোন কাজগুলি অন্যের সাথে গল্প করার পর তাকে সুখ দেয়। এমনকি অনেক সময় চাওয়াগুলি পুরোপুরি স্পষ্টও থাকেনা। একটা কী যেন নাই, কী যেন নাই ভাব, কিন্তু কী তা জানা নেই।

তবে সবারই হয়ত কোন না কোন খুব গোপন শখ থাকে, যেটা পূরণ হলে হয়ত তার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। এ ধরণের চাওয়াগুলি সে বলতে পছন্দ করে না। কারণ বললে মনে হয় যেন এই চাওয়ার রহস্যাবৃত সৌন্দর্যটা মলিন হয়ে যাবে।

তবুও, এই চাওয়াগুলি মনের এমন একটা দিক – যা নিয়ে বেশি মাথা না ঘামানোই ভাল। কারণ এখানে যেহেতু অনেক বেশি অস্পষ্টতা আছে – এই এক্সপেক্টেশনের সাথে জড়িয়ে একপক্ষের মনে এমন অনেক প্রতিক্রিয়া আসতে পারে, অপরপক্ষ হয়ত যার থই ও পাবে না। এ ধরণের না বলা গোপন আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরিই অপ্রয়োজনীয় হিসেবে তুলে রাখা উচিৎ। পেলে খুবই ভাল, তবে না পেলে তা নিয়ে যেন এক কণা দুঃখও না থাকে।

শয়তান মানুষের এই হিডেন এক্সপেক্টেশনের হা হুতাশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখে। কারণ এখানে যুক্তিহীন আবেগ, বাস্তববোধহীন আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ অনেক বেশি থাকে, যা প্রায়শঃই হতাশায় রূপ নেয়। এই অবাস্তব না পাওয়ার দুঃখ অনেক বাস্তব কাজের এপ্রিসিয়েশন কে মলিন করে দেয়। এতে করে পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধার অভাব তৈরি হয়।

মানুষ তাদের সম্পর্কের মধ্যকার সমস্যাগুলোকে যেন আরেকটু যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে পারে সেই আশায়ই লেখা। এভাবে দেখলে আশা করি দুই পক্ষের কার কোথায় নিজেকে শোধরানোর সুযোগ আছে তা সহজে বুঝতে পারবে।

* * *

6/27/2011, 3:00:00 PM